Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 119-123
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে তারশঙ্করের "বিচারক" – জনপ্রিয়তা ও শিল্পগুণের মেলবন্ধন

সুব্রত সূত্রধর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Abstract

There are many films in India Cinema, which are the adaption of writing of well-known writers. Tarasankar Bondopadhayay's 'Bicharak' is one of them. Tarasankar many novels 7 short stories are being adapted by many film makers. In some cases the adaption is brilliant, up to the mark, more promising than the original story. But in some cases these are hot that much successful. P. Mukhopadhyay is the director of the film 'Bicharak'. He has tried his best to make the film adaption of the novel more successful as well as artistic. We have tried to discuss the various sides of the film with a critical points of view in our article.

মূলধারা এবং স্বতন্ত্রধারা ছাড়াও একধরনের চলিচ্চিতত্র নির্মিত হয় যেগুলো জনপ্রিয়তা ও শিল্পগুণের মধ্যে একটা সমতা রেখে চলে । যদিও এই ধারাটির সাথে অন্য দুই ধারার পারস্পরিক ভেদরেখা খুবই সূক্ষ্ম তা সত্ত্বেও এর অস্তিত্ব কোনভাবেই অনস্বীকার্য নয় । মূলধারা বা মেইনস্ট্রীম ধারাকে বাণিজ্যিকভাবে সফলতাকামী চলচ্চিত্রের ধারায় পর্যায়ভুক্ত করলে এমনও কিছু চলচ্চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে যেগুলোতে দর্শকের মনোরঞ্জন করার উপাদানটির পাশাপাশি শিল্পগুণও বিশেষ প্রাধান্য পায় । এমনও বলা যায় যে এর শৈল্পিকতাই মনোরঞ্জন সাধন করে । তরুণ মজুমদারের 'গণদেবতা', সলীল সেনের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', বিজয় বসুর 'আরোগ্য নিকেতন', পলাশ ব্যানর্জির 'অগ্রদানী' প্রমুখ চলচ্চিত্র সমূহেও আমরা এই দুই উপাদানের সহাবস্থান লক্ষ্য করতে পারি । তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য আশ্রয়ী এই চলচ্চিত্রগুলিতে সাহিত্যে শৈল্পিকতা চলচ্চিত্রের আদলে নবনির্মিত হয়ে যথার্থ অর্থেই সার্থকতা পেয়েছে । উভয়ের বহিঃপ্রকাশ তথা উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শিল্পগুণ কখনোই খর্বিত হয়নি, এবং একই সাথে জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে ।

প্রভাত কুমার মুখোধ্যায় পরিচালিত বিচারক উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নও এই ঘরানায়ই সামিল । যেহেতু সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুই সম্পূর্ণ পৃথক মাধ্যম তাই উভয়ের পরিবেশনায় কিছু পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে । এই পার্থক্যগুলি অন্বেষণ করে এতে সাহিত্যের সার্থকতা ও বিচ্যুতি খোঁজার প্রচেষ্টাই আমাদের অভিসন্দর্ভের বিষয় । তারাশঙ্করের বিচারক উপন্যাসটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৫৯ সালের ১২ মার্চ চলচ্চিত্রায়িত করেন । কাহিনির প্রধান চরিত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষালের চরিত্রে অভিনয় করেন স্বয়ং উত্তমকুমার । তাঁর স্ত্রী সুরমার চরিত্রে থাকেন অরুন্ধতী দেবি,

এবং আরও দুটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেন পাহাড়ী সান্যাল ও ছবি বিশ্বাস । ছবিটির প্রযোজনা করে প্রভাত প্রডাকশন । সঙ্গীত পরিচালনা করেন তিমির বরণ ।

তাঁরাশঙ্করের উপন্যাসের সূচনা এবং চলচ্চিত্রটির প্রথম দৃশ্যপট একেবারেই অভিন্ন । প্রথমেই পাঠক এবং দর্শক উভয়েই উপস্থাপিত হন এক বিশাল কোর্টরুমে, যেখানে বিচার চলছে এবং বিচারকের আসনে বসে আছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ওরফে উত্তমকুমার ।

আশোক স্তম্ভখচিত প্রতীকের নীচেই বিচারকের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। অচঞ্চল, স্থির, নিরাসক্ত মুখ, অপলক চোখের দৃষ্টি । যে দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত কিন্তু কোন কিছুর ওপর নিবদ্ধ নয়। উত্তমকুমারের অভিনয়ে উদ্ধৃত অংশটির প্রত্যেকটি অভিব্যাক্তি স্পষ্ট। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথের দৈহিক বর্ণনায় "গৌরবর্ণ সুপুরুষ, সবল কর্মঠ দেহ, কিন্তু মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে। নায়কের আউটলুকের পরিকাঠামোয় বেমানান বলে সম্ভবত এই বিচ্যুতি ।

উপন্যাসে জ্ঞানেন্দ্রনাথের চারিত্রিক বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি ঘটনা আর্দালির মুখে বর্ণিত হয়েছে । চলচ্চিত্রে এই ঘটনাগুলো ফ্ল্যাশব্যাক হিসেবে উঠে এসেছে । জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্থিরতা, তারঁ নিরাসক্তি, তাঁর হাসি-প্রত্যেকটির একেকটি বিশেষ ব্যাঞ্জনা ছিল । উত্তমকুমারের অভিনয়ের কুশলতায় এর কোনটিই খর্বিত হননি । উপন্যাসের একটি অংশে আমরা পেয়েছি ।

"সুরমা বলেছিলেন- আছা বলতে পার । সংসারে এমন মানুষ কেউ আছে যার ভুল হয় না ?
জ্ঞানান্দ্রনাথ বলেছিলেন – না নেই ।
সুরমা বলেছিলেন – তবে ?
-কি তবে
-এই যে তুমি ভাব তোমার রায় এমন হবে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেউ পাল্টাতে পারবে না। হাইকোর্ট না, সুপ্রীমকোর্ট না – এত দম্ভ তোমার কেন ? জ্ঞানেন্দ্রনাথ হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন। .....দম্ভ নয়, হাইকোর্টে রায় টিকবে কি না টিকবে সেও নয়, সে কখনও ভাবিনে। ভাবি আজ নিজে যে রায় দিলাম সে রায় দু মাস কি ছ মাস কি ছ বছর পরে ভুল হয়েছে বলে নিজেই নিজের উপর যেন অনুশোচিত না হই। শেষটায় খুব রাগ করে তুমি ভগবানের কথা তুললে-। মধ্যে মধ্যে জজগিরি আর ভগবানগিরির সঙ্গে তুলনা যখন করলে তখন ভগবানগিরির যে সব বর্ণনা তোমরা কর-ভাল ভাল কেতাবে আছে – সেই থেকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে বলি, আমার জজিয়তি ভাগবানগিরির চেয়েও কঠিন। কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান, তাঁর উপরে মালিক কেউ নেই, সূক্ষ্ম বিচারক নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও অটোক্র্যা। অন্তত করুণা করতে তো বাধা নেই। ইছে করলেই আসামীকে দোষী জেনেও বেকসুর মাফ করে খালাস দিতে পারেন। পাপপুণ্যের ব্যালান্সশীট তৈরী করে পুণ্য বেশি হলে পাপগুলোর চার্জশীট অয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করতে পারেন। মানুষ জজ তা পারে না। আমি তো পারিই না"।[১]

এখানেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট, আর উত্তমকুমার দর্শকের সম্মুখে উজ্বল । জ্ঞানেন্দ্রনাথ চরিত্রটি ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম গ্রন্থীর বুনোটে তৈরি করেছেন তারাশঙ্কর । তরুণী সুরমার দ্বারা ব্যাখ্যাত ভ্যাবাকান্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্থির বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে পথচলা-এতে বিভিন্ন স্তর সংযুক্ত হয়েছে যার প্রতিটি বিবরণ চলচ্চিত্রের স্বল্পকাঠামোয় জায়গা করে নিতে না পারলেও দর্শকের মানস অভিব্যক্তিতে যথার্থ ভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

উপন্যাসের শুরুতে কোর্টরুমে যে বিচিত্র খুনের মামলার অবতারণা, এর চলচ্চিত্রায়নে পরিচালক কোন আরোপিত পরিবর্তন সাধন করেনি । বরং ঘটনাটিকে অবিকল রেখে পরিচয়পর্বেই কাহিনি ও চরিত্রগুলিকে দর্শক সম্মুখে তার যথাপ্রাপ্ত অবস্থানে উপনীত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন । ধর্মের টানে মায়ের পিতৃহত্যাকারী ব্যাভীচারী পুত্রের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্যদান এর ঘটনাটিতে তারাশঙ্কর যেভাবে জ্ঞানেন্দ্রনাথের দ্বারা এক অমোঘ সত্যধর্মের

বিশালতার অভিব্যাক্তি অবতারণা ঘটিয়েছেন, তা সার্থক ভাবেই চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে । এই সত্যধর্মের বিচারেই পিতৃহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হয়েছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ে লিখেছেন –

"এই মায়ের সাক্ষ্য আমি অকৃত্রিম সত্য বলে বিশ্বাস করি" ।[২] মাসের সাক্ষ্যপ্রমাণে পিতৃহত্যার দায়ে পুত্রের প্রাণদণ্ড-এই অমোঘ রায়ের প্রেক্ষিতে সুরমা দেবী যখন বলেছেন-

"ওই মায়ের কথাই ভেবে দেখ । সে হতভাগিনীর আর কি থাকবে বল?" [৩] তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথের দেওয়া উত্তর – "ধর্ম । ..... হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম কি কৃশ্চান ধর্ম কি কৃশ্চান ধর্ম নয় সুরমা – সত্যধর্ম"। [৪] এই সংলাপে যেমন তারাশঙ্করের বিচারকের তেমনি প্রভাতকুমারের বিচারকেও এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। এখানে মূল কাহিনির সংলাপের ব্যাঞ্জনাই এত দৃঢ়রূপ নিয়েছে যাতে পরিচালককে আর কোন পরিবর্তনের পথে হাঁটতে হয়নি ।

সাহিত্যে আখ্যান এগোনোর সাথে সাথে আমরা যেভাবে বিচারক থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথের দিকে যাত্রা করি, তার জীবনধারা, তার পাওয়া, তার না পাওয়ার গ্লানি ইত্যাদির সাথে পরিচিত হই,- তেমনি সিনেমাতেও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনের নানান টুকরো টুকরো ছবি ইত্যাদির সাথে পরিচিত হই,- তেমনি সিনেমাতেও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনের নানান টুকরো টুকরো ছবি, তার জীবনের ইতিহাস ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে আমদের সামনে একের পর এক উঠে আসে । আমাদের পরিচিতি হয় সুরমার সাথে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী সুমতির সাথে । সুরমার পিতা তথা জ্ঞানেন্দ্রনাথের আইনগুরু জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জির সাথে । কাহিনির গভিরে লুকিয়ে থাকা নানা তথ্য উঠে আসে একে একে । একই জায়গায় কর্মাধীন থাকার দরুন অরবিন্দ চ্যাটার্জি একদিন আবিস্কার করেন জ্ঞানেন্দ্রের স্ত্রী সুমতির সাথে তার মৃত মায়ের চেহারায় আশ্চর্য মিল । পিতার মাতৃ আবেগ সুরমাকে বাধ্য করে সুমতি জ্ঞানেন্দ্রর বাড়ি গিয়ে সেই আশ্চর্য মিলের রহস্য উদঘাটন করতে । সে জানতে পারে সুমতি তার নিজের পিসতুতো বোন- "জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি সুমতির মামা। সুমতির মায়ের সহোদর ভাই । কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্মণ হয়ে সুরমার মাকে বিবাহ করেছিলেন বলে বাপ ত্যজ্যপুত্র করেন । ছেলের নাম মুখে আনতে বাড়িতে বারণ ছিল । কোন সম্পর্কও ছিল না দুই পক্ষের মধ্যে । অরবিন্দবাবু বিলেতে গেলেন, ব্যারিস্টার হয়ে এসে বিচার বিভাগে চাকরী নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন"[৫]

ধীরে ধীরে সুমতি জ্ঞানেন্দ্রের সাথে অন্তরঙ্গতা বাড়ে সুরমার পরিবার । বলা ভালো অন্তরঙ্গতা বাড়ে সুরমা আর জ্ঞানেন্দ্রর । ঘরকুনো, ধর্মভীরু, শ্যামলা, অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য স্ত্রী সুমতির বিপরীতে কলেজে পড়া, অতি আধুনিকা, কবিতা লিখতে পারা সুরমার দিকে জ্ঞানেন্দ্রের ঝোঁক বাড়তে থাকে । এই অন্তরঙ্গতার ব্যাখ্যায় পরস্পরকে কবিতা লেখার প্রসঙ্গ উপন্যাসে আমরা পাই-

"দীর্ঘদিন পরে সুরমা কবিতা লিখে তাকে শোনাতে চেয়েছে । সুরমা কবিতা লেখে, তার ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লেখে তখন হাসির কবিতা। সে-কালে নাম করেছিল । সুরমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর তিনিও কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন । কবিতায় সুরমার কবিতার উত্তর দিতেন তিনি । এবং আবিস্কার করেছিলেন যে তিনিও কবিতা লিখতে পারেন । অন্তর পারতেন"[৬]

কিন্তু চলচ্চিত্রে সুরমা দেবীকে দু-এক বার কবিতা পাঠ করতে দেখা গেলেও জ্ঞানেন্দ্রনাথের কবিতার সাথে কোন সংযোগের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়নি ।চলচ্চিত্রের সীমায়িত পরিসরে এতটা বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভব নয় বলেই সম্ভবত এই বর্জন । উপন্যাসের আরেকটি জায়গায় একটি 'অহিংস সিংহ ও তার শাবকগণ' নামের একটি প্রবন্ধ বের হওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে । মূলত গান্ধিজিকেকে আক্রমণ করেই লেখা এই প্রবন্ধ । লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথ লিখেছেন ছদ্মনামে। কিন্তু এই জ্ঞানেন্দ্রনাথই গান্ধিজির মৃত্যুতে শোকাহত, উপন্যাসে রয়েছে,

"গান্ধীজির মৃত্যুর পর গোটা রাত্রিদিনটা তিনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন একটা ঘরের মধ্যে উপবাস করে ছিলেন। জীবনে গান্ধীজি সম্পর্কে তিনি যতকিছু মন্তব্য করেছিলেন ডায়েরী উলটে উলটে সমস্ত দেখে তার পাশে লাল কালির দাগ দিয়ে লিখেছিলেন-ভুল,ভুল"।[৭]

জ্ঞানেন্দ্রনাথের গান্ধিজি সম্পর্কে এই মানস পরিবর্তন সম্ভবত তার রচয়িতার আবেগপ্রসূত। জানা যায় লেখক তারাশঙ্কর গান্ধিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্ভবত তার এই বিশ্বাসই জ্ঞানেন্দ্রের মানস পরিবর্তনের হেতু । কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় হল এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি প্রভাত কুমারের 'বিচারক' এ অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গটি যেখানে আখ্যানে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তব পরিকাঠামোর স্থাপন করতে অবশ্যম্ভাবী ছিল, পরিচালক সেখানে এই পথে না এগিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথের মানবিক টানা পোড়েনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকেই অধিক গুরুত্ব দিলেন ।

এভাবেই নানা গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে 'বিচারক' উপন্যাসটি । উপন্যাসটির শেষে সুমতির মৃত্য কাহিনি বর্ণনায়ও পরিচালকের সাথে লেখকের একটু পার্থক্য রয়ে গেছে । সুরমা ও জ্ঞানেন্দ্রের অন্তরঙ্গতা নিয়ে প্রথম থেকেই সুমতির মনে আগুনের ক্ষীণ আভা জ্বলছিল। টনিস ম্যাটে জেতার পর সুরমা জ্ঞানেন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোলা ছবি সুমতির হাতে পরলে সেই ক্ষীণ আভা দপ করে জ্বলে ওঠে। কাহিনিকার লিখেছেন,

"সুমতির অন্তরের আগুন তখন বাইরে জ্বলছে । সে তখন উন্মত্ত । শুধু ওই কখানা ফটো উনুনে গুঁজেই সে ক্ষান্ত হননি, আরো কয়েকখানা বাঁধানো ছবি ছিল সুরমার, তার একখানা সুরমার কাছে সুমতি নিজেই চেয়ে নিয়েছিল আর একখানা সুরমার আত্মীয়তা করে দিয়েছিল সে কখন ওকে পেড়ে আছড়ে কাঁচ ভেঙ্গে ছবি গুলোকে গুঁজে দিয়েছিল আর তার সঙ্গে গুজে দিয়েছিল সুরমার চিঠিগুলো"।[৮]

এই উনুন চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত । সেখানে এসেছে সাজানো জ্বলন্ত বখারি। যার আগুন থেকেই পুড়ে গেছে সুমতির সংসার, মসীলিপ্ত হয়েছে জ্ঞানেন্দ্রর সারাটা জীবন। এই মসী, এই কালিকে চিরকালই অস্বীকার করে গেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ । কিন্তু এর ছোপ তাঁকে ছাড়তে পারেনি। তাই বিচারধীন আসামী নগেনের বিচারের রায় দিতে গিয়েই তিনি আবিস্কার করেছেন এতকাল ধরে আপনার অন্তরে লুকিয়ে রাখা অপরাধ বোধকে, পাপবোধকে । পাপ পূণ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মানেন না, ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই । তিনি নাস্তিক । কিন্তু আপন অন্তরের চেতনাতেই তাঁকে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পনে বাধ্য করেছে-তিনি বলেছেন, এখানে আমার উপলব্ধি হচ্ছে ঈশ্বরত্বই নিজেকে প্রকাশ করেছে মানব চৈতন্যের মধ্য দিয়ে।[৯] ক্ষমা চাইছেন সেই অমোঘ সত্ত্বাধিপতি বিচারকের কাছে। বলেছেন, "বিচার কর আমার, শাস্তি দাও । তমশার সকল গ্লানির উর্ধ্বে উত্তীর্ণ করো আমাকে । মুক্তি আমাকে ।[১০]

এই মহান উপলব্ধিতে অবতীর্ণ হওয়ার এই যে ঘটনা বয়ান-এতে কাহিনিকার তারাশঙ্কর যেমন, তেমনি পরিচালক প্রভাতকুমারও সমান ভাবে সার্থকতা লাভ করেছেন ।

কাহিনি রচনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ যেহেতু সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার, তাই কিছু গ্রহণ বর্জন তো রয়েছেই তা সত্ত্বেও তুল্যমূল্য বিচারে সার্থকতার পরিমাপই মহৎ আকার লাভ করেছে ।

উল্লেখপঞ্জি:-

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সপ্তপদী', নিতাই বসু সম্পাদিত, পুনশ্চ প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত রচনা', কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭, পৃষ্টা-১৫৫ ।
২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সপ্তপদী', নিতাই বসু সম্পাদিত, পুনশ্চ প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত রচনা', কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭, পৃষ্টা-১৫৫ ।

৩। আহরিত, চলচ্চিত্র/১৯৬৩, পুনর্মুদ্রণঃঅনন্যা, এপ্রিল ১৯৬৩ ।
অসীম সোম, ছবি, দর্শক ও অন্যান্য কথা', পৃষ্টা-১৪০ ।
৪। অসীম সোম, প্রতিবেদন-১ মারি সিটন ও কলকাতার ফিল্ম সেমিনার 'চলচ্চিত্র বিচিত্র,
পৃষ্টা - ৫৯
৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিচারক', নিতাই বসু সম্পাদিত, পুনশ্চ প্রকাশিত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত রচনা', কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭, পৃষ্টা – ১৫৯ ।
৬। ঐ, পৃষ্টা- ১৬০ ।
৭। ঐ, পৃষ্টা – ১৬১ ।
৮। ঐ, পৃষ্টা – ১৬৪ ।
৯। ঐ, পৃষ্ট – ১৬৫ ।
১০। ঐ, পৃষ্টা – ১৭২ ।